মোগল শাসন (১৫৫৬-১৭০৭ খ্রি.)

ইউনিট ৩

ভূমিকা

সম্রাট আকবরের সময়কাল থেকে ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থিতিশীল অবস্থায় পৌছায়। সম্রাট আকবরের সময় থেকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকাল পর্যন্ত (১৫৫৬-১৭০৭ খ্রি.) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তার লাভ করে। এ সময়ের মোগল শাসকদের জনহিতকর বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মোগল সাম্রাজ্য উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে। তা সত্ত্বেও এক সময় সম্রাট বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে সম্রাট আকবরের রাজ্য বিস্তার, তাঁর প্রশাসনিক নীতি, ভূমি শাসন ব্যবস্থা, পরবর্তী সম্রাটগণের কৃতিত্ব, মোগল আমলে ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৩.১ আকবরের ক্ষমতা গ্রহণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আকবরের রাজ্য সীমা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আকবর কর্তৃক ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল আক্রমণের কারণ উল্লেখ করতে পারবেন।
- আকবরের বিভিন্ন বিজয় অভিযানের বিবরণ দিতে পারবেন।
- আকবরের সমরাভিযানের ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	আকবর, পানিপথ, রাজপুতনা, কাবুল, কান্দাহার

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি পিতা সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যুর পর মাত্র ১৩ বছর বয়সে জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ আকবর নাম ধারণ করে দিল্লির মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেন। মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের মধ্যে সাম্রাজ্যের সংগঠক ও বিজেতা হিসেবে সম্রাট আকবর অনন্য স্থান দখল করে আছেন। ইতিপূর্বে সুলতানি আমলে একমাত্র আলাউদ্দীন খলজী সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সম্রাট আকবর ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর রাজ্য জয় ও সাম্রাজ্য বিস্তৃতি নীতি অব্যাহত রাখেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সম্রাট আকবর

সম্রাট আকবর যখন ক্ষমতা গ্রহন করেন তখন মোগল সাম্রাজ্য পাঞ্জাব, দিল্লি ও আগ্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবর আফগান শাসক আদিল শাহ সুরের সেনাপতি হিমুকে পরাস্ত করেন। মোগল শাসনের ইতিহাসে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ছিল চূড়ান্ত মীমাংসাত্মক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয়ের ফলে ভারতে মোগল শক্তি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতে

আফগানদের আধিপত্যের অবসান হয়। এর ফলে মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় এবং মোগল সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়।

আকবরের সাম্রাজ্য

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর সম্রাট আকবর ভারতের পূর্বাঞ্চলে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। তিনি বৈরাম খানের সাহায্যে গোয়ালিয়র, আজমীর ও জৌনপুর অধিকার করেন। ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে আকবরের সেনাপতি আদম খান ও পীর মুহম্মদ মালবরাজ রাজবাহাদুরকে পরাজিত করে মালব জয় করেন।

গন্ডোয়ানা অধিকার- ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে আকবর কারা প্রদেশের শাসনকর্তা আসফ খানকে গন্ডোয়ানা জয় করার জন্য প্রেরণ করেন। কারার বীরাঙ্গনা রাণিমাতা দুর্গাবতী দেশ রক্ষার্থে যুদ্ধেক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন। গন্ডোয়ানা থেকে হলে বহু ধনরত্ন মোগলদের হস্তগত হয়।

রাজপুতনা অভিযান- সম্রাট আকবর ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে খাজা মঈনউদ্দিন চিশতীর মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আজমীর যাত্রার সময় কৌশলী নীতি অবলম্বন করে অম্বর বা জয়পুরের রাজা বিহারীমলের বশ্যতা লাভ করেন। তিনি বিহারীমলের কন্যাকে বিবাহ করেন করেন এবং বিহারীমলের পুত্র ভগবান দাস ও পৌত্র মানসিংহকে মনসবদার রূপে নিয়োগ করেন। আকবর ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ সম্রাট। তিনি রাজপুতদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে আফগানদের ধ্বংসের কৌশল গ্রহণ করেন। তাঁর এই মৈত্রী নীতি ফলপ্রসূ হয়েছিল। ইতোমধ্যে যোধপুরও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু মেবারের রানা উদয়সিংহ কিছুতেই মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। এছাড়া উদয়সিংহ পলাতক মালবরাজ রাজবাহাদুরকে আশ্রয় দান করে আকবরের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেন। উদয়সিংহ নিকটবর্তী পর্বতে গিয়ে আত্মগোপন করেন। উদয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রতাপসিংহ ও পৌত্র অমরসিংহ মোগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান। প্রতাপসিংহ ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে হলদিঘাটের যুদ্ধে এবং ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে অমরসিংহ মানসিংহের নিকট পরাজয় বরণ করেন। আকবর তাঁর জীবদ্দশায় সমগ্র মেবার মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন নি। পরবর্তীতে আকবর রনথম্ভোর, কালিঞ্জর, বিকানী প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। রাজপুতনা এলাকায় নিজের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করে আকবর গুজরাট ও সুরাট অধিকার করেন।

আকবরের রাজদরবার

বাংলা অধিকার- ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শেষ আফগান শাসক দাউদ খান কররানি মোগল সেনাবাহিনীর হাতে রাজমহলের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলে বাংলা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তবে ঢাকাসহ পূর্ব বাংলার কয়েকজন প্রভাবশালী জমিদার মোগল বাদশার আনুগত্য অস্বীকার করে সতের শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন।

কাবুল ও কান্দাহার জয়- আকবরের বৈমাত্রেয় ভাই কাবুলের শাসনকর্তা মির্জা মুহম্মদ হাকিম উত্তর ভারত থেকে পালিয়ে যাওয়া কিছু বিদ্রোহীদের প্ররোচনায় ভারত আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। সম্রাট আকবর এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে কাবুল আক্রমণ করেন। তিনি বিদ্রোহী ভাইকে পরাজিত করে কাবুল অধিকার

করেন। তিনি ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে কান্দাহার দখল করে রাজ্যের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে নিরাপত্তা বিধানে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে তিনি কাশ্মীর, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান জয় করে সমগ্র উত্তর ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে বলখ ও বদখশান অধিকার করে আফগান উপজাতি উজবেগ ও ইউসুফজাইদেরকে নিয়ন্ত্রন করেন।

দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বিস্তার- সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকুন্ডা, বিদর এবং খান্দেশ এই পাঁচটি স্বাধীন মুসলিম রাজ্য ছিল। এদের মধ্যে আহমদনগর ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। আকবর প্রথমে দূত পাঠিয়ে এসব রাজ্যের সুলতানদের মোগল আধিপত্য মেনে নেয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু একমাত্র খান্দেশের সুলতান সম্রাট আকবরের আনুগত্য স্বীকার করে। ফলে আকবর সমরাভিযানের প্রস্তুতি মনোনিবেশ নেন। ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে মোগল বাহিনী আহমদনগর অভিযানে বের হয়। আহমদনগরের রাণী চাঁদ সুলতানা আকবরকে বেরার প্রদেশ দান করে তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে চাঁদ সুলতানার মৃত্যুর পর আহমদনগর আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

ইতোমধ্যে খান্দেশের নতুন সুলতান মীরন বাহাদুর মোগল আনুগত্য অস্বীকার করেন। আকবর স্বয়ং খান্দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং রাজধানী বুরহানপুর অধিকার করেন। মীরন বাহাদুর আত্মরক্ষার্থে সুরক্ষিত আসিরগড় দুর্গে আশ্রয় নেন।

১৬০১ খ্রিস্টাব্দে আকবর দুর্ভেদ্য দুর্গ আসিরগড় অধিকার করেন। আসিরগড়ই ছিল আকবরের সর্বশেষ রাজ্য জয়। তিনি আহমদনগর, বেরার ও খান্দেশ নিয়ে একটি সুবাহ গঠন করেন এবং যুবরাজ দানিয়েলকে এই সুবাহর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এভাবে দক্ষিণে কৃষ্ণানদী পর্যন্ত আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলো।

শিক্ষার্থীর কাজ	আকবরের রাজ্য জয় একটি মানচিত্রে প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন।

সারাংশ

সম্রাট আকবরের ক্ষমতা গ্রহণের সময় মোগল রাজত্ব পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রার মধ্যে সীমিত ছিল। আকবর দীর্ঘ ৪০ বছর সমরাভিযান পরিচালনা করে তাঁর রাজ্য উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণানদী এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। এই বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সম্রাট আকবর সম্মুখ সমরের পাশাপাশি কখনও কখনও কূটনীতিরও আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সম্রাট আকবর কত বছর বয়সে দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন?
ক) ১২ খ) ১৩ গ) ১৪ ঘ) ১৫

২। বাংলা কত খ্রিস্টাব্দে মোগল সাম্রাজ্যেভুক্ত হয়?
ক) ১৫৭৬ খ) ১৫৭৭ গ) ১৫৭৮ ঘ) ১৫৭৯

৩। আকবরের শেষ সমরাভিযান কোনটি?
ক) হলদিঘাটের যুদ্ধ খ) বাংলা বিজয়
গ) আসির গড়ের যুদ্ধ ঘ) কাবুল ও কান্দাহার বিজয়

৪। রানী চাঁদ সুলতানা কোন মুসলিম রাজ্যের রানী ছিলেন?
ক) আহমদ নগর খ) বিজাপুর
গ) গোলকুন্ডা ঘ) খান্দেশ

৫। বাংলার শেষ আফগান শাসক ছিলেন–
ক) সুলেমান কররানি খ) তাজখান কররানি
গ) দাউদ খান কররানি ঘ) বায়জিদ কররানি

সজৃনশীল প্রশ্ন

সেলিম অল্প বয়সে পিতৃ সিংহাসনে আরোহন করেন। তার রাজ্যের রাজপুত ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিল বীর ও স্বজাত্যবোধে সচেতন যোদ্ধা হিসেবে খ্যাত। রাজ্যের স্থায়ীত্ব ও সম্প্রসারনের জন্য তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আত্নীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ কর। উচ্চ রাজপদে নিয়োগ প্রদান, সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতা করা, সর্বোপরি বশ্যতা স্বীকার না করলে সমরাভিযান পরিচালনা করা প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি দীর্ঘস্থায়ী এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. কত খ্রিস্টাব্দে পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ১

খ. মোগলদের সাম্রাজ্য সীমার বিবরণ দিন। ২

গ. উদ্দীপকের সেলিমের গৃহিত নীতির সাথে পাঠ্য পুস্তকের মোগল আমলের কোন সম্রাটের গৃহীত নীতির সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. উক্ত সম্রাটের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৩.২ আকবরের শাসনকাল : ভূমি রাজস্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সম্রাট আকবরের শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা।
- সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতির কারণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- আকবরের রাজপুত নীতির ফলাফলের বিবরণ দিতে পারবেন।
- সম্রাট আকবরের সময়ের গৃহীত ভূমি ব্যবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	রাজপুত, রণথম্ভোর, যোধপুর, জয়সালমীর, বিকানী, চিতোর, পরাউতি, চাচর, বনযর

সম্রাট আকবর ভারতে মোগল শাসন বিস্তার ও সুদৃঢ় করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে তার রাজপুত নীতি, ভূমি ব্যবস্থা তথা মনসবদারী প্রথা ইত্যাদি।

সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতিঃ ভারতে মোগল রাজ্য বিস্তারের বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান শক্তি ছিল রাজপুত জাতি। জাতিগতভাবে রাজপুতরা ছিল বীর ও স্বজাত্যবোধে সচেতন যোদ্ধা। সম্রাট আকবর রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি যৌক্তিক রাজপুত নীতি গ্রহণ করেন। তাঁর রাজপুত নীতিকে দুভাগে ভাগ করা যায় মিলনাত্বক নীতির অংশ হিসেবে **১.** মিত্রতামূলক নীতি এবং **২.** যুদ্ধদেহী নীতি।

আকবর রাজপুতদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, তাদেরকে উচ্চ পদে নিয়োগ, জিযিয়া ও তীর্থ কর রহিতকরণ, এবং রাজপুত সংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষকতা করে মিত্রতা স্থাপন করেন। আকবর স্বয়ং অম্বররাজ বিহারীমলের, বিকানীর ও জয় সিলমিরের রাজপুত কুমারীকে বিয়ে করেন। তিনি ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে যুবরাজ সেলিমের সাথে জয়পুরের রাজা ভগবান দাসের কন্যার বিয়ে দেন। তিনি রাজার টোডরমল, রাজা বিহারী মল, ভগবান দাস এবং মানসিংহকে প্রশাসনের উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। তিনি জিযিয়া ও তীর্থযাত্রীদের কর বাতিল করেন। তিনি কবি পণ্ডিত ও চিত্রশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যুদ্ধাংদেহী নীতির অংশ হিসেবে আকবর রনথম্ভোর, যোধপুর, জয়সালমীর, বিকানী এবং চিতোর রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এই অঞ্চলগুলোতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজপুত নীতির ফলাফল

আকবরের রাজপুত নীতি মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। এর ফলে মোগলরা পরবর্তী চার পুরুষ ব্যাপী রাজপুতদের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করে। এ ছাড়াও রাজপুত ও মোগল সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ধারা লক্ষ্য করা যায়।

আকবরের ভূমি শাসন ব্যবস্থা

সম্রাট আকবরের ভূমি শাসন ব্যবস্থা অনন্য কৃতিত্বের দাবীদার। শেরশাহের রাজস্ব-সংস্কার নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে মুজাফ্ফর খান তুরবতী ও রাজা টোডরমলের সহযোগিতায় আকবর রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। তাঁর রাজস্ব নীতির মূল লক্ষ্য ছিল- ১. জমির শ্রেণি বিভাগকরণ, ২. উৎপন্ন শস্যের উপর ভিত্তি করে রাজস্ব নির্ধারণ।

ভূমি জরিপ ও ভূমির শ্রেণি বিভাগ

সম্রাট আকবরের অর্থমন্ত্রী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত টোডরমল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সকল জমি জরিপ করিয়ে উর্বরতা ও কত কাল যাবৎ চাষাবাদ করা হয়-এসব তথ্যর ভিত্তিতে চাষের জমি সমূহকে ৪ ভাগে ভাগ করেন। যথা **১. পোলাজ জমি**— এ সমস্ত জমি প্রতি বছর চাষ করা হত। ২. **পরাউতি জমি**— এ ধরনের জমি একবার চাষের পর উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কিছুদিন অনাবাদী রাখা হত। ৩. **চাচর জমি**— এ সমস্ত জমি তিন বা চার বছর পর পর চাষ করা হত। ৪. **বনযার জমি**— এ ধরনের জমি পাঁচ বছরের জন্য অনাবাদী থাকত। প্রথম দুই ধরনের ভূমি থেকে উৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশ ভূমি রাজস্ব হিসেবে গৃহীত হতো। চাচর ও বনযার জমির উপর সামান্য হারে রাজস্ব ধার্য করা হয়। কৃষকগণ নগদ টাকায় অথবা শস্যে খাজনা দিতে পারতো। এই ভূমি রাজস্ব নীতি 'যাবতী' বা টোডরমলের 'রায়তওয়ারী' প্রথা নামে পরিচিত। এছাড়াও কোন কোনো জমির উৎপাদিত ফসলের ১/৩ অংশ সরকার কর হিসেবে পেত। সাম্রাজ্যের কোনো কোনো সুবাহতে ফসল উৎপাদনের কোনো জরিপ না করে অনুমানের ভিত্তিতে সরকার ও রায়তের মধ্যে ফসল ভাগ করা হতো।

প্রত্যেক সুবাহ বা প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বলা হতো দিওয়ান। তিনি আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সুবাদারকে প্রয়োজনীয় অর্থ দেয়ার পর উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় রাজকোষে প্রেরণ করতেন। বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও আর্থিক দুর্যোগের সময় রাজস্ব আদায় শিথিল করা হতো। প্রয়োজনে খাজনা মওকুফ করার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। রাজস্ব কর্মচারিদের দুর্নীতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হতো।

ফলাফল

এই রাজস্ব নীতির ফলে কৃষক ও রাষ্ট্র উভয় পক্ষই লাভবান হয়। রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হওয়ায় রাষ্ট্রের ঘাটতি কমে যায় এবং রাজস্ব কর্মচারিদের দুর্নীতি বন্ধ হয় এবং পাশাপাশি কৃষকদের আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আকবরের রাজস্ব নীতি নিয়ে শিক্ষার্থীগণ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে একটি বিতর্ক সভা আয়োজন করবে।

সারাংশ

সম্রাট আকবর রাজ্যের স্থায়িত্ব ও বিস্তৃতির লক্ষ্যে রাজপুতদের প্রতি শুধু মিলনাত্মক নীতিই গ্রহণ করেন নি, বরং তার পাশাপাশি তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেন। তাঁর রাজপুত নীতির ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। যুবরাজ সেলিম কত খ্রিস্টাব্দে ভগবানদাসের কন্যাকে বিবাহ করেন?

ক) ১৫৮০ খ) ১৫৮২ গ) ১৫৮৪ ঘ) ১৫৮৬

সাইফের সাম্রাজ্যের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিল বীর ও জাতীয়তাবোধে সচেতন যোদ্ধা জাতি। তাদেরকে বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য তিনি মিলনাত্মক ও যুদ্ধংদেহী নীতি গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

২। উদ্দীপকের সাইফের গৃহিত নীতির সাথে পাঠ্য পুস্তকের মোগল আমলের কোন সম্রাটের গৃহীত নীতির সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

ক) বাবর খ) হুমায়ুন গ) আকবর ঘ) জাহাঙ্গীর

৩। রাজা টোডরমল কোন সম্রাটের অর্থমন্ত্রী ছিলেন?
ক) বাবর খ) হুমায়ুন গ) আকবর ঘ) জাহাঙ্গীর

৪। রাজা টোডরমল চাষের জমিসমূহ কয়ভাগে ভাগ করেন?
ক) দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ

৫। প্রতি বছর চাষ করা হতো যে জমি, তাকে বলা হয়–
ক) পরাউতি খ) চাচর গ) বনযার ঘ) লোপাজ

উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

রানী বিলকিসের ভূমি কর্মকর্তা রাজ্যের সব জমি জরিপ করে জমিগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে উৎপন্ন ফসলের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ করতেন।

৬। উদ্দীপকের রানির ভূমি কর্মকর্তার সাথে পাঠ্য পুস্তকের মোগল আমলের কোন ব্যক্তির সাদৃশ্য পাওয়া যায়।
ক) রাজা টোডরমল খ) মুজাফ্ফর খান গ) ফৈজী ঘ) আবুল ফজল

৭। উক্ত ব্যক্তির গৃহিত নীতির ফলে–
i. কৃষক ও রাষ্ট্র উভয়ই উপকৃত হয়
ii. কর্মচারীদের দুর্নীতি বন্দ হয়
iii. কৃষকগণ সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৩ সম্রাট আকবরের শাসনকাল: ধর্মনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সম্রাট আকবরের ধর্মীয় নীতি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সম্রাট আকবরের উদার ধর্মীয় নীতির প্রভাবক বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত দীন-ই-ইলাহী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	দীন-ই-ইলাহী, জাল্লাজালালুহু, ধর্মীয় উদারতা

সম্রাট আকবর ছিলেন ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত ও পরধর্মসহিষ্ণু। সকল ধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন সমানুরাগী। তাঁর এই উদার ধর্মীয় নীতির পিছনে নিম্নোক্ত কারণ কার্যকর ভূমিকা পালন করে:

১. **গৃহশিক্ষক ও পারিবারিক প্রভাব:** আকবরের গৃহশিক্ষক আব্দুল লতিফ উদারপন্থী ছিলেন, তাঁর পিতা ও পিতামহ এমন কি মাতা হামিদা বানু কেউই গোঁড়া ছিলেন না। তিনি প্রথম জীবনে সুফি শেখ মুবারক ও তাঁর দুই পুত্র ফৈজী এবং আবুল ফজলের দ্বারা প্রভাবিত হন। বাল্যকালেই তিনি সুফি ধর্মমতের প্রভাবে আসেন। এর ফলে তিনি পারিবারিক ঐতিহ্যে ধর্মীয় উদার ও সহিষ্ণু ব্যক্তি হিসেবে বড় হন।

২. **ভক্তি ও মাহদী আন্দোলনের প্রভাব:** ষোল শতক ছিল ধর্ম আন্দোলনের যুগ। আকবর ছিলেন সে যুগের প্রতিচ্ছবি। কবীর, গুরু নানক, শ্রী চৈতন্য, রামানন্দ প্রমুখ মরমী সাধকগণ আকবরের ধর্মনীতিকে প্রভাবিত করেছিলেন। ভারতের ভক্তি ও মাহদী আন্দোলনের প্রভাব জনসাধারণের মনকে সম্রাট আকবরকেও নাড়া দিয়েছিল।

৩. **ইবাদত খানায় বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতগণের আলোচনার প্রভাব:** সম্রাট আকবর দর্শন ও ধর্মীয় আলোচনার জন্য ফতেহপুর সিক্রিতে ইবাদতখানা নির্মাণ করেন। কিন্তু এইখানে আমন্ত্রিত আলেমগণের আলোচনায় তিনি বিদ্বেষ ও ধর্মীয় গোঁড়ামি, ব্যক্তিগত আক্রমণের মনোভাব ও ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা লক্ষ করেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে এইভাবে সত্যের সন্ধান করা বৃথা। তাই তিনি 'অভ্রান্ত বা সর্বময় কর্তৃত্বের' ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা দ্বারা সম্রাট রাষ্ট্র ও ধর্ম বিষয়ক যেকোনো সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করেন। তবে এর ফলে গোঁড়া সুন্নী মুসলমানরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

৪. **রাজনৈতিক কারণ:** সম্রাট আকবর উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবর্ষ বিভিন্ন ধর্মের মানুষের দেশ। ফলে মোগল শাসক গোষ্ঠী হিসেবে ভারতীয়দের সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ করতে হলে ধর্মীয় ব্যাপারে সহনশীল ও উদার নীতি গ্রহণ করতে হবে।

দীন-ই-ইলাহী

সম্রাট আকবর ১৫৮২ সালে 'দীন-ই-ইলাহী' নামে একেশ্বরবাদমূলক এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। সকল ধর্মের সারবস্তু নিয়ে এই ধর্মমত গঠিত হয়। এই ধর্মমতের কালেমা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আকবর খলিফাতুল্লাহ'। দীন-ই-ইলাহী রীতি-নীতি, বিধানগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. এই ধর্মের অনুসারীগণ পরস্পর দেখা হলে, 'আসসালামু আলাইকুম' এর পরিবর্তে 'আল্লাহু আকবার' এবং প্রত্যুত্তরে 'ওয়া আলাইকুম আস্‌সালাম' না বলে 'জাল্লাজালালুহু' বলা।
২. এই ধর্মীয় বিধান অনুসারে মৃত্যুর পরে নয়, মৃত্যুর পূর্বেই দাওয়াত বা আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করা।
৩. সভ্যগণ নিজ নিজ জন্মদিন পালন এবং ভোজের আয়োজন করবেন।
৪. সভ্যগণ ভিক্ষা প্রদান করবেন কিন্তু ভিক্ষা গ্রহণ করবেন না।
৫. এই ধর্মমত গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা হবে না।

ড. ভি. স্মিথের মতে, সংকীর্ণ অর্থে আকবরের দীন-ই-ইলাহী কোনো ধর্ম নয়। এটি ছিল একটি জীবন দর্শন মাত্র। সম্রাট আকবর জোর করে তাঁর ধর্মমত কারও উপর চাপিয়ে দেন নি। এ জন্যই দীন-ই-এলাহীর দীক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তির সংখ্যা ছিল মাত্র বিশজন। এদের একমাত্র হিন্দু ছিলেন রাজা বীরবল এবং বাকী সকলেই মুসলমান। দীন-ই-এলাহীর মাধ্যমে সকল ধর্মের সারাংশের এক অপুর্ব সংমিশ্রণ সাধন করা ছিল আকবরের উদ্দেশ্য। এর পিছনে তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদেরকে একসঙ্গে নিয়ে আসা। দীন-ই-ইলাহী সম্রাট আকবরের মৃত্যুর (১৬০৫ খ্রি.) সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়।

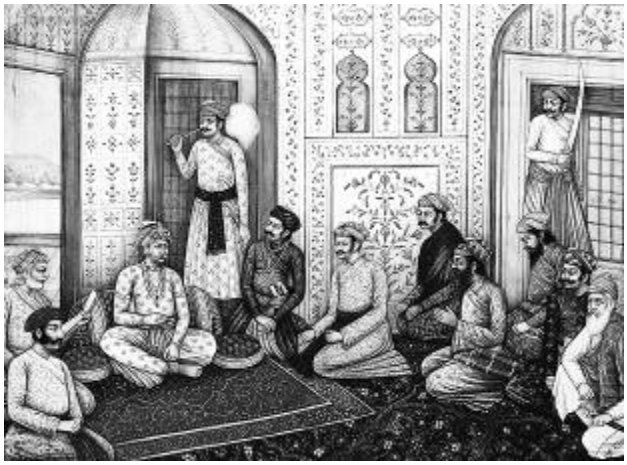

আকবরের বিখ্যাত সভাসদদের নয়জন (নবরত্ন)

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ আকবরের ধর্মনীতি নিয়ে একটি বিতর্কসভার আয়োজন করবেন।

সারাংশ

সম্রাট আকবর ধর্মীয় সংস্কার মুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন প্রভাব তাঁর ধর্মীয় উদার নীতির জন্য দায়ী ছিল। তিনি সব ধর্মের সার নিয়ে দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন করেন। কিন্তু এ মতবাদ তাঁর মৃত্যুর পরপরই বিলুপ্ত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। 'দ্বীন-ই-ইলাহী' এর প্রবর্তক কে?
ক) বাবর খ) হুমায়ুন
গ) আকবর ঘ) জাহাঙ্গীর

২। সম্রাট আকবর কত খ্রিস্টাব্দে দ্বীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন করেন?
ক) ১৫৮১ খ) ১৫৮২
গ) ১৫৮৩ ঘ) ১৫৮৪

৩। ধর্মান্দোলনের যুগ কোনটি?
ক) ত্রয়োদশ খ) চতুদর্শ
গ) ষোড়শ ঘ) সপ্তদশ

৪। সম্রাট আকবর ফতেহপুর সিক্রিতে নির্মাণ করেন–
ক) ইবাদত খানা খ) বৈঠক খানা
গ) মসজিদ ঘ) দরবার খানা

৫। দ্বীন-ই-ইলাহীর' বিধানগুলোর মধ্যে ছিল–
i. মৃত্যুর পূর্বেই দাওয়াত বা আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করা
ii. সদস্যদের মাংস ভক্ষণ নিষেধ
iii. সদস্যরা ভিক্ষা প্রদান করবেন, গ্রহণ করতেন না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

জামাল উদ্দিনের রাজ্যের অধিকাংশ জনগণ হিন্দু ধর্মের অনুসারী; কিন্তু শাসকগোষ্ঠী মুসলমান। তদুপরি ধর্মীয় নেতাদের আলোচনায় বিদ্বেষ, ধর্মীয় গোড়ামী ও ব্যক্তিগত আক্রমনের মনোভাব লক্ষ্য করে বিভিন্ন ধর্মগুরুদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও পর ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা দুর করার উদ্দেশ্যে জামালউদ্দিন এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। সব ধর্মের সার নিয়ে এই ধর্মমত প্রবর্তন করলেও তার মৃত্যুর পরপরই এই নতুন ধর্মীয় মতবাদ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ক. "ইমাম-ই-আদিল" খেতাব গ্রহণ করেন কে? ১
খ. ভারতে "ভক্তি ও মাহদী" আন্দোলনের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকের জামাল উদ্দিনের নতুন ধর্মমত প্রবর্তনের সাথে মোগল যুগের যে সম্রাটের ধর্মমত প্রবর্তনের সাদৃশ্য পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. "ষোল শতক ধর্মান্দোলনের যুগ"– পাঠ্য পুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৩.৪ জাহাঙ্গীরের শানসনকাল ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালের জনহিতকর কাজের বিবরণ দিতে পারবেন।
- জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সম্রাট জাহাঙ্গীরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	জাহাঙ্গীর, নূরজাহান, প্রথম জেমস্।

সামরিক সাফল্য

১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর যুবরাজ সেলিম 'নুরউদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজী' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আকবরের মতো প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন না হলেও তিনি একজন দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের সংহতি বাংলার বার ভূঁইয়াদের দমন এবং মেবার বিজয় করেন। তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়েরও উদ্যোগ গ্রহণ করে ছিলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর

জনহিতকর কাজ

সম্রাট জাহাঙ্গীর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে আকর্ষণীয়, প্রজ্ঞাবান, দয়ালু ও বুদ্ধিমান শাসক। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি কতগুলো জনহিতকর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রজা সাধারণের মন জয়ের চেষ্টা করেন। যাঁরা তাকে সিংহাসন লাভে সহায়তা করেছিলেন তিনি তাঁদেরকে পদোন্নতি প্রদান করেন। অধিকার যারা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন তাদেরও তিনি উদারতা ও ক্ষমা প্রদর্শন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর পিতার সময়ের বেশকিছু নির্যাতনমূলক আইন বাতিল করেন এবং 'দস্তুর-উল-আমল' নামে ১২টি আইন প্রণয়ন করে দয়া ও উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। একজন সাধারণ প্রজাও সরাসরি সম্রাটের বিচারপ্রার্থী হতে পারতেন। ধনী ও গরিব সকলেই যেন তাঁর নিকট সরাসরি বিচারপ্রার্থী হতে পারে সেজন্য সম্রাট ষাটটি ঘণ্টাযুক্ত একটি সোনার শিকল আগ্রার প্রাসাদ থেকে যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। যেকোন বিচার প্রাথী শিকলে টান দিলে ষাটটি ঘন্টা একসাথে বেজে উঠত এবং সম্রাট যেখানেই থাকুন না কেন দরবার কক্ষে উপস্থিত হয়ে বিচার প্রার্থীর অভিযোগ শুনে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি

প্রজাদের প্রতি এমনি দয়া ও মহানুভবতা সত্ত্বেও সম্রাটের চরিত্রে বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর চরিত্রে দয়া-দাক্ষিণ্য ও কোমলতার পাশাপাশি শত্রু দমনে ও অপরাধীর শাস্তি বিধানে কঠোরতা, নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম, শিল্প-সংস্কৃতি ও বাণিজ্য নীতি

সম্রাট জাহাঙ্গীর সকল ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি কোনো প্রকার গোঁড়ামী পছন্দ করতেন না। ফকির, দরবেশ, জ্ঞানী-গুণীদের তিনি সমাদর করতেন। সাহিত্য, শিল্পকলা ও চিত্রশিল্পে তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। সম্রাট নিজে চিত্রকর ও কবি ছিলেন। *তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী* রচনা করে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এটি ছিল তাঁর আত্মজিবনী যেখানে সমসাময়িক মোগল ইতিহাসের অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সাহিত্যের উৎকর্ষতার কারণে তাঁর সময়কালকে অনেকে মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্যের 'অগাস্টাস যুগ' বলে অভিহিত করেন। সম্রাটের এতসব গুণ থাকা সত্ত্বেও মদ্যপান এবং অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে। রাজত্বের শেষভাগে স্ত্রী নূরজাহান ও তাঁর ভাই আসফ খান সম্রাটের উপর বিশেষ প্রভাববিস্তার করেছিলেন। ফলে সাম্রাজ্যের কোনো কোনো অঞ্চলে গোলযোগ দেখা দেয়। ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের জন্য তিনি ভারতবর্ষে পর্তুগিজদের সব রকমের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও ইংরেজ বণিকদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন এবং সুরাটে কারখানা নির্মাণের অনুমতি দেন। ক্যাপ্টেন হকিন্স ও টমাস রো নামক দু'জন ইংরেজ দূত ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের পত্র নিয়ে হাজির হন। এসকল দূতরা ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সম্রাটের নিকট থেকে সুবিধা আদায় করেন। তার সময় থেকেই ভারতে ব্রিটিশদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারের সূত্রপাত ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিচারকাজ সম্পর্কে শিক্ষার্থীগণ দলীয়ভাবে আলোচনা করবেন।

সারাংশ

সম্রাট জাহাঙ্গীর মোগল সম্রাটদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন দয়ালু ও প্রজারঞ্জক সম্রাট, তবে প্রয়োজনে তিনি কঠোর ও নিষ্ঠুর হতে পারতেন। তাঁর আমলে সাম্রাজ্যের শান্তি সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সম্রাট জাহাঙ্গীর কত খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন?
ক) ১৬০৫ খ) ১৬০৬ গ) ১৬০৭ ঘ) ১৬০৮

২। জাহাঙ্গীর "দস্তুর-উল-আমল" নামে কয়টি আইন প্রণয়ন করেন?
ক) ১১ খ) ১২ গ) ১৩ ঘ) ১৪

৩। আগ্রার প্রাসাদ থেকে যমুনার তীর পর্যন্ত ঝোলানো সোনার শিকলে কয়টি ঘন্টা ছিল?
ক) ৫০ খ) ৫৫ গ) ৬০ ঘ) ৬৫

৪। *তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী* কে রচনা করেন?
ক) আকবর খ) জাহাঙ্গীর গ) শাহজাহান ঘ) আওরঙ্গজেব

৫। জাহাঙ্গীরের সময়ে সুরাটে কারখানা নির্মাণ করে–
ক) পর্তুগিজরা খ) ওলন্দাজরা গ) ইংরেজরা ঘ) ফরাসিরা

৬। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলের নানা তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাস রচনা করেন–
i. টমাস রো
ii. এডওয়ার্ড টেরি
iii. ক্যাপ্টেন হকিন্স
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৫ শাহজাহানের শাসনকাল ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সম্রাট শাহজাহানের শাসনকাল সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা উপস্থাপন করতে পারবেন।
- বিজেতা ও শাসক হিসেবে শাহজাহানের কৃতিত্বের বিবরণ দিতে পারবেন।
- সম্রাট শাহজাহানের সময়কালের স্থাপত্য শিল্পের বিবরণ দিতে পারবেন।
- সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের প্রধান ঘটনাবলি ও এর ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	শাহজাহান, তাজমহল, নতুন দিল্লি

১৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর সম্রাট জাহাঙ্গীর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর শাহজাদা খুররম ও শাহরিয়ারের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শাহরিয়ার শ্বাশুড়ি নূরজাহানের প্ররোচনায় লাহোরে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। শাহজাদা খুররমের শ্বশুর আসফ খান নিজ জামাতাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাকে পরাজিত করেন এবং অন্ধ করে। দিয়ে সিংহাসনের অনুপযুক্ত করে দেন। শাহজাদা খুররম দাক্ষিণাত্যে ছিলেন তিনি আগ্রায় ফিরে আসেন এবং ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি 'আবুল মুজাফফর শিহাব উদ্দিন মুহাম্মদ শাহজাহান বাদশাহ গাজী' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর ত্রিশ বছরের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল।

সম্রাট শাহ্জাহান

মোগল ইতিহাসে সম্রাট শাহজাহানের জীবনালেখ্য বৈচিত্রময় ঘটনায় পরিপূর্ণ। একজন জনপ্রিয় সম্রাটরূপে তিনি ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সমরকুশলী হিসেবে সম্রাট শাহজাহান দক্ষতার পরিচয় দেন। মোগল আধিপত্য বিস্তারেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর আমলে আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডায় মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি পর্তুগিজদের দমন করে হুগলী দখল করেন।

সুশাসন, ন্যায়বিচার ও বদান্যতার জন্য শাহজাহানের শাসনকাল উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রশাসনের প্রতিটি স্তরের কার্যক্রম নিজে তদারক করতেন এবং প্রজাদেরকে সন্তানতুল্য বিবেচনা করতেন। তবে অপরাধীদেরকে কঠোর শাস্তি দানে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে সর্বপ্রথম পশ্চিম এশিয়ার এবং ইউরোপের সাথে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

তাজমহল

সম্রাট শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্য পিপাসু শিল্পমনা মানুষ। The Prince of Builder নামে খ্যাত সম্রাট শাহজাহানের আমলে মোগল শিল্প ও স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। সম্রাটের স্ত্রী মমতাজ মহলের সমাধির উপর নির্মিত স্মৃতিসৌধ তাজমহল বিশ্বের স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম একটি নিদর্শন ও স্ত্রীর প্রতি তার

ভালবাসার অনন্য বহি:প্রকাশ। দেশি বিদেশি কুড়ি হাজার শিল্পী ও কারিগরের বাইশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে নির্মিত তাজমহলকে ঐতিহাসিক হ্যাভেল ভারতের 'ভেনাস দ্যা মিলো' নামে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া মতি মসজিদ, দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, জামে মসজিদ তাঁর আমলের স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম কীর্তি। শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসন তাঁর শিল্পানুরাগের এক অপূর্ব নিদর্শন। 'শাহজাহানাবাদ' নামে একটি নতুন নগর তিনি নির্মাণ করান যা বর্তমানে নতুন দিল্লী নামে পরিচিত। এ সকল স্থাপত্য নির্দশনের নির্মাণ কৌশলে ভারতীয় ও পারসিক স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর সময়ে চিত্র শিল্পের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। তিনি হস্তলিপি বিদ্যারও পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব : সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ ছিলেন সম্রাটের প্রিয় এবং তিনি পিতার সাথে আগ্রাতে অবস্থান করছিলেন। অন্য তিন পুত্রের মধ্যে সুজা বাংলায়, আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে এবং মুরাদ গুজরাটের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই সময় দারা শিকোহ অসুস্থ সম্রাটের শয্যাপাশে থেকে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। দীর্ঘ সময় রাজকার্যে সম্রাটের অনুপস্থিতি এবং দারাশিকোর ক্ষমতা গ্রহণের স্পৃহা শাহজাহানের অন্য তিন পুত্রের ভিতর সন্দেহের সৃষ্টি করে এবং এর ফলে উত্তরাধিকার যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে।

উত্তরাধিকার যুদ্ধের কারণ

১. **সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব-** মোগলদের সুনির্দিষ্ট কোনো উত্তরাধিকার নীতি ছিল না। ফলে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ এবং ভ্রাতৃ কলহ আগেও একাধিকবার সংঘটিত হয়েছিল। সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাবেই শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যেও গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

২. **ভাইদের প্রতি দারার অশোভন আচরণ-** সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতার খবর দারা গোপন রাখেন এবং রাজধানী আগ্রার সাথে বাংলা, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের যোগাযোগের সব রাস্তা বন্ধ করে দেন। দারার এমনি ধরনের আচরণ ভাইদের মাঝে সংঘাত অনিবার্য করে তোলে।

৪. **দারার প্রতি শাহজাহানের অন্ধ স্নেহ ও পক্ষপাতিত্ব-** সম্রাট শাহজাহান দারার প্রতি সমর্থন জানান এবং তাকে সিংহাসন লাভের জন্য আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দেন। তিনি দারার পরামর্শে আওরঙ্গজেবকে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজয়ে বাধা দেন। দারার প্রতি তাঁর এই পক্ষপাতিত্ব উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের ইন্ধন যোগায়।

উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের প্রধান ঘটনা প্রবাহ

বাংলার শাসনকর্তা সুজা দারার দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম নিজকে মোগল সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন এবং সসৈন্য রাজধানী আগ্রা দখল করতে অগ্রসর হন। ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে বাহাদুর গড়ের যুদ্ধে দারার সৈন্য দ্বারা পরাজিত হন। পরাজিত হয়ে সুজা বাংলায় ফিরে যান এবং পরবর্তীতে আরাকানীদের হাতে নিহত হন।

অন্যদিকে গুজরাটে মুরাদ স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। শাহজাদা আওরঙ্গজেব ছিলেন ধীরস্থির ও বিচক্ষণ প্রকৃতির। তিনি অন্য ভাইদের মতো নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন নি। মুরাদের সাথে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেন এবং তাদের সম্মিলিত বাহিনী উজ্জয়িনীর নিকট ধর্মাটে সম্রাট বাহিনীর মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধে সম্রাট বাহিনী পরাজিত হয়। এই ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ হয়ে দারাশিকো ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে তার পূর্ণ শক্তি সহকারে সামুগড়ে ভ্রাতাদের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে পরাস্ত হন এবং দিল্লীতে পালিয়ে যান। সামুগড়ের যুদ্ধেই উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের ফয়সালা হয়ে যায়।

দারাকে অনুসরণ করে আওরঙ্গজেব আগ্রা অধিকার করেন। তিনি বৃদ্ধ সম্রাট শাহজাহানকে নজরবন্দী করেন এবং কৌশলে বন্দী করে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করেন। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেব 'আবুল মোজাফ্ফর মহিউদ্দীন মুহম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশা গাজী' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবর্তী কালে বিভিন্ন অভিযোগের কারণে দারা এবং মুরাদকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এইভাবে দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের উত্তরাধিকার যুদ্ধের উপর একটি নাটিকা রচনা করবেন।

সারাংশ

মোগল শাসনামলের মধ্যে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল স্বর্ণযুগ হিসেবে খ্যাত। তাঁর আমলে রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয়। দেশে শান্তি সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল। ভারতবর্ষের স্থাপত্য শিল্পে এক অপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়। সম্রাট জাঁকজমকপূর্ণ দরবার বজায় রাখেন। এসব কারণে মোগল ইতিহাসে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। "Prince of Builders" নামে খ্যাত কে?
ক) আকবর খ) জাহাঙ্গীর গ) শাহজাহান ঘ) আওরঙ্গজেব

২। কোন সম্রাট পর্তুগিজদের দমন করে হুগলী দখল করেন?
ক) হুমায়ুন খ) আকবর গ) জাহাঙ্গীর ঘ) শাহজাহান

৩। তাজমহল নির্মাণে কত বছর সময় লেগেছিলো?
ক) ২০ খ) ২১ গ) ২২ ঘ) ২৩

৪। ময়ুর সিংহাসন নির্মাণ করেন কে?
ক) জাহাঙ্গীর খ) শাহজাহান গ) আওরঙ্গজেব ঘ) শাহ আলম

৫। সম্রাট শাহজাহান "শাহজাহানাবাদ" নামে একটা নতুন নগর নির্মাণ করেন। উক্ত নগরের বর্তমান নাম কী?
ক) আহমেদাবাদ খ) নতুন দিল্লি গ) ফিরোজাবাদ ঘ) গুজরাট

সৃজনশীল প্রশ্ন

সুমাইয়া নামের এক অপরূপ সুন্দরী মহিলাকে তাওহীদ বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহের অল্পকাল পরেই তাওহীদের স্ত্রী পরলোক গমন করেন। প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি অগাধ ভালোবাসা আর আবেগকে অম্লান করে রাখার জন্য, স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার স্মৃতিকে জীবন্ত করে রাখার জন্য তাওহীদ তার স্ত্রীর সমাধির উপর অনেক অর্থ ব্যয়ে, অনেক দিন ধরে সুন্দর সুন্দর কারুকার্য খোচিত অপরূপ সৌন্দর্য-মণ্ডিত এক স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করেন।

ক. ভারতের "ভেনাস দ্যা মিলো" কী? ১
খ. বর্হিবাণিজ্য কাকে বলে? ২
গ. উদ্দীপকের স্মৃতি সৌধ নির্মাণের সাথে পাঠ্য পুস্তকের সম্রাটের স্মৃতি সৌধ নির্মাণের কী সাদৃশ্য আছে তা ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. "উক্ত সম্রাটের জাঁক-জমক ও ব্যয় বাহুল্যের অন্তরালে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ অংকুরিত হয়েছিল"– আপনি কী একমত? পাঠ্য পুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৩.৬ আওরঙ্গজেবের শাসনকাল ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আওরঙ্গজেবের সামরিক সাফল্যের বিবরণ দিতে পারবেন।
- আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধার্মিক মুসলমান ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আওরঙ্গজেবের কৃতিত্বের উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	আওরঙ্গজেব, গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, মারাঠা

সম্রাট শাহজাহানের জীবদ্দশায় সংঘটিত উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে বিজয়ী হয়ে ১৬৫৮ খিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব বাদশাহ আলমগীর উপাধি নিয়ে মোগল সিংহাসনে বসেন। ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে তিনি একজন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। ঐতিহাসিক স্টেন্‌লি লেনপুল আওরঙ্গজেবকে মোগল বংশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক বলেছেন। তিনি আকবর অপেক্ষা বৃহত্তর সাম্রাজ্য শাসন ও বিশালতর সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কত্ব করেছিলেন। সম্রাট হয়েও তিনি সরল ও পবিত্র জীবনযাপন করতেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক সম্রাট আওরঙ্গজেবকে ধর্মান্ধ ও গোঁড়া মুসলমান হিসেবে অভিযুক্ত করলেও নিঃসন্দেহে তিনি একজন ধর্মপ্রাণ সম্রাট ছিলেন। রাজ্য শাসন ব্যবস্থায় তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। তিনি নিজের সুখ-সুবিধা অপেক্ষা প্রজাদের কল্যাণের কথা বেশি ভাবতেন।

সামরিক সাফল্য

সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন সুদক্ষ সমর নায়ক। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। জীবনে খুব কম যুদ্ধেই তিনি পরাজয় বরণ করেছিলেন। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চল জয় তাঁর সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করেছিল।

বাদশাহ আওরঙ্গজেব

সম্রাট শাহজাহানের সামরিক সাফল্যের পর আওরঙ্গজেবের শাসনামলে সর্বাপেক্ষা আলোচিত বিষয় ছিল দাক্ষিণাত্য নীতি। যা একটি বিতর্কিত বিষয়।

কেউ কেউ মনে করেন যে তাঁর এই নীতি ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অন্যান্যদের ধারণা এই যে, তাঁর নীতির মূল উদ্দেশ্য মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি। এ ছাড়াও সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি বা দাক্ষিণাত্যে সামরিক অভিযানের অন্যান্য কারণ হচ্ছে:

১. দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলো মোগল সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ ছিল।
২. গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সুলতানদের কর দিতে অস্বীকৃতি।
৩. মারাঠা নেতা শম্ভুজী সম্রাটের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে আশ্রয় দান।
৪. দাক্ষিণাত্যে মারাঠারা এ সময় খুব শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং মোগল সাম্রাজ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণ ভারত অভিযান

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয়কে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমত পর্যায়: সিংহাসনে আরোহণ থেকে শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা পর্যন্ত। মারাঠা বীর শিবাজী দাক্ষিণাত্যে প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে উঠলে আওরঙ্গজেব তাঁকে দমন করার জন্য প্রথমে শায়েস্তা খানকে এবং পরবর্তী সময়ে দিলীর খান ও জয়সিংহকে তাঁর বিরুদ্ধে পাঠান। শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরিত দ্বিতীয় অভিযান সফল হলেও মারাঠা শক্তিকে পুরোপুরি ধ্বংস করা সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয় পর্যায়: এটি ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়ে সম্রাট আওরঙ্গজেব বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে দমন ও শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য দখল করেন। তৃতীয় পর্যায়: ১৬৮৭ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট আওরঙ্গজেব শম্ভুজী ও অন্যান্য মারাঠা নেতার ক্ষমতা ধ্বংস সাধন করেন। আওরঙ্গজেব দীর্ঘ ২৫ বছর (১৬৮২-১৭০৭ খ্রি.) দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করেছিলেন। এ সময়ে শম্ভুজী পরাজিত ও নিহত হন এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মোগল-মারাঠা সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে।

দাক্ষিণাত্য নীতির ফলাফল

দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে আওরঙ্গজেবের রাজ্যসীমা কাবুল থেকে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মীর থেকে কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁর দাক্ষিণাত্য নীতির ফলাফল নিম্নরূপ :

১. আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য দখল করলে পরোক্ষভাবে মারাঠা শক্তি উত্থানের পথ উন্মুক্ত হয়। বস্তুত বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা ছিল মারাঠাদের স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বী মোগলদের নিকট এদের পরাজয়ের ফলে মারাঠারা প্রাথমিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামুক্ত হয়ে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ পায়।

২. দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে বিস্তৃত সুবিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র থেকে শাসন পরিচালনা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

৩. দীর্ঘ সময় সম্রাটের দাক্ষিণাত্যে অবস্থানের কারণে উত্তর ভারতে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আফগান, জাঠ, মেওয়াটি, শিখ ও রাজপুতরা মোগল প্রশাসনিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে।

৪. অবিরাম যুদ্ধের ফলে রাজকোষে চরম অর্থ সংকট দেখা দেয়। কৃষি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ অবস্থা মোগল রাজকোষের উপর দারুন চাপ সৃষ্টি করে। রাজকোষ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় সৈন্যদের বেতন বকেয়া পড়তে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলে সেনা অসন্তোষ দেখা দেয়। তাই কোনো কোনো ঐতিহাসিক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে সম্রাট সব কিছু লাভ করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি সব কিছুই হারালেন। ঐতিহাসিক স্মিথ বলেন, দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের খ্যাতি ও দেহের সমাধি ক্ষেত্র রচিত হয়।

আওরঙ্গজেবের সময় মোগল সামাজ্য

ধর্মপ্রাণ ও শিক্ষানুরাগ মুসলমান

সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন একজন বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি শিক্ষাবিদদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। পবিত্র কুরআন তাঁর মুখস্থ ছিল এবং বহু হাদিস তাঁর জানা ছিল। তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত ফেকাহ গ্রন্থ *ফতোয়া-ই-আলমগিরী* প্রণীত হয়। তিনি নিজ হাতে কোরআন শরীফ নকল করতেন ও টুপি সেলাই করতেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব বহু সদগুণের অধিকারী ছিলেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানের (মানচিত্রসহ) উপর একটি রচনা লিখবেন।

সারাংশ

সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন আদর্শবান সম্রাট ছিলেন। সফল সমর নায়ক হিসেবেও তিনি তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না, তবে ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁর বহু গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন দাক্ষিণাত্যে সামরিক অভিযান ও তার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের প্রক্রিয়া তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই শুরু হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয় এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ বিজয়ের ফলে সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হলেও দেশে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। মোগল বাহিনীর কাছে মারাঠা নেতা শিবাজী ও শম্ভুজী পরাজিত হলেও মারাঠা শক্তির পুরোপুরি ধ্বংস সাধন সম্ভব হয় নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আওরঙ্গজেব কত খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন?
ক) ১৬৫৮ খ) ১৬৫৯ গ) ১৬৬০ ঘ) ১৬৬১

২। আওরঙ্গজেব কত বছর রাজত্ব করেন?
ক) ৪৮ খ) ৪৯ গ) ৫০ ঘ) ৫১

৩। আওরঙ্গজেব শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রথম কার নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন?
ক) শায়েস্তা খান খ) দিলীর খান গ) জয়সিংহ ঘ) মানসিংহ

৪। আওরঙ্গজেব কত বছর দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করেন?
ক) ২২ খ) ২৫ গ) ২৭ ঘ) ২৯

উদ্দীপকটি পড়ুন ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
নিজাম উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে জয়লাভ করে পিতৃ সিংহাসনে আরোহন করেন। কিন্তু বিদ্রোহী পুত্র ও প্রাদেশিক শাসকদের দমন করতে দীর্ঘদিন তাকে রাজধানীর বাহিরে অবস্থান করতে হয়। ফলে সাম্রাজ্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়।

৫। উদ্দীপকের নিজামের সাথে কোন মোগল সম্রাটের সাদৃশ্য আছে?
ক) আকবর খ) জাহাঙ্গীর গ) শাহজাহান ঘ) আওরঙ্গজেব

৬। উক্ত সম্রাটের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে সাম্রাজ্য সীমা বিস্তার লাভ করে–
i. কাবুল থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত
ii. কাশ্মীর থেকে কাবেরী পর্যন্ত
iii. হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। "ফাতোয়া-ই-আলমগিরী" কী?
ক) ফেকাহ শাস্ত্র খ) রাজনীতি শাস্ত্র গ) অনুবাদ গ্রন্থ ঘ) আত্মজীবনী

৮। "ফাতোয়া-ই-আলমগিরী" কার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রণীত হয়?
ক) আকবর খ) জাহাঙ্গীর গ) শাহজাহান ঘ) আওরঙ্গজেব

পাঠ-৩.৭ মোগল যুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মোগল যুগের প্রশাসনিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মোগল সম্রাটের ক্ষমতার বিবরণ দিতে পারবেন।
- বিভিন্ন মোগল প্রশাসনিক বিভাগের কাজের বিবরণ দিতে পারবেন।
- প্রাদেশিক শাসন সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	ওয়াজির, দিউয়ান, সুবাহ, সরকার, পরগনা, সুবাহদার

মোগল শাসনব্যবস্থা এক-কেন্দ্রিক ও স্বৈরতন্ত্রী হলেও জনকল্যাণকামী ছিল। এই শাসনব্যবস্থা ছিল প্রধানত সামরিক শক্তি নির্ভর। তাই একমাত্র সদর ও কাজী ছাড়া অন্যসব কর্মচারিকে সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হত। মোগল শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি রচিত হয় তুর্কি-পারস্য শাসন ব্যবস্থার অনুকরণে। মোগলরা একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার পাশাপাশি স্থানীয় প্রাদেশিক শাসন কাঠামোও গড়ে তুলেছিল।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন

মোগল শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার উৎস ছিলেন 'পাদশাহ' বা সম্রাট। এটি ফার্সি শব্দ যা বাংলায় বাদশাহ হিসেবে ব্যবহৃত। তিনি একাধারে রাষ্ট্রীয় প্রধান, সামরিক প্রধান এবং প্রধান বিচারক হিসেবে রাজ্য পরিচালনা ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতেন। রাজকর্মচারিরা তাদের স্ব স্ব কর্মকান্ডের জন্য বাদশাহের কাছেই দায়বদ্ধ থাকতেন। কর্মচারিদের চাকরির কার্যকাল সম্রাটের ইচ্ছা এবং সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করত।

দফতর সৃষ্টি:

মোগল আমলে প্রশাসনিক কর্মকান্ড সুষ্ঠ ভাবে চালানোর উদ্দেশ্যে কতগুলো দফতর বা অফিস সৃষ্টি করা হয়। প্রত্যেক দফতর একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার দ্বারা পরিচালিত হত।

ওয়াজির বা প্রধানমন্ত্রী:

সম্রাটের পরই প্রধানমন্ত্রী বা ওয়াজিরের স্থান ছিল। তিনি কোনো কোনো সময় রাজস্ব বিভাগও দেখাশুনা করতেন। তবে মোগল প্রশাসনের ওয়াজিরের পদ অপরিহার্য ছিল না। তাই মোগল আমলে সব সময় ওয়াজির নিযুক্ত হত না।

প্রশাসনিক বিভাগ সমূহ:

১. মোগল আমলের রাজস্ব বিভাগের যাবতীয় কার্যভার দিউয়ানের ওপর ন্যস্ত ছিল। তিনি অর্থনৈতিক বিভাগের পরিচালনা ও পরিদর্শন করতেন। এছাড়াও তিনি সরকারি অফিসার ও সম্রাটের মধ্যে প্রধান মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি হিসেবে কাজ করতেন। দিউয়ান-ই-খালাসা, দিউয়ান-ই-জায়গীর ও দিউয়ান-ই-তাউজিব পদবীধারী কর্মকর্তাগণ দিউয়ানকে সহযোগিতা করতেন।

২. মীর বকসি ছিলেন সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ রাজকর্মচারি। সৈন্য সংগ্রহ, অশ্ব পরিদর্শন, মনসবদার প্রভৃতি কর্মচারির তালিকা সংরক্ষণ প্রভৃতি তাঁর দায়িত্ব ছিল। এছাড়া মীর-ই-বহর ছিলেন নৌবহরের প্রধান।

৩. মীর-ই-সামান ছিলেন সম্রাটের গৃহ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারি। তিনি সম্রাটের পরিবারবর্গের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, খাদ্য প্রভৃতি তদারক করতেন।

৪. সদর-উস-সুদূর ছিলেন ধর্মীয় সম্পত্তি, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও সরকারি দান বিভাগের অধিকর্তা।

৫. কাজী-উল-কুজ্জাত বা প্রধান কাজী ছিলেন সম্রাটের অধীনে সর্বোচ্চ বিচারপতি। তিনি প্রাদেশিক কাজী নিয়োগ ও তাদের কাজ তত্ত্বাবধান করতেন। মুফতি তাঁকে আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতেন।

এছাড়াও অন্যান্য রাজকর্মচারীর মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজ পরিচালিত হতো এবং জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা বিধান করা হত।

প্রাদেশিক শাসন

বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু শাসনের জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে কতগুলো 'সুবাহ' বা প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল। সুবাহদার ছিলেন সুবাহর প্রধান কর্ম নির্বাহক। পদমর্যাদায় সুবাহদারের পরেই ছিল প্রাদেশিক দিউয়ান। প্রদেশের আর্থিক উন্নতি এবং রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনা ছিল দিউয়ানের দায়িত্ব। সুবাহদার ও দিওয়ান তারা উভয়ই সরাসরি বাদশাহের কাছে তাদের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা করতেন এ দুজন প্রধান কর্মকর্তা ছাড়া প্রদেশের অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে সদর ও কাজী, বক্শী, ওয়াকিয়া নবিস, কোতোয়াল ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য কর্মকর্তা। মোগল আমলে প্রতিটি প্রদেশ কয়েকটি সরকার বা জেলায় এবং প্রতিটি সরকার কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত ছিল। ফৌজদার ও শিকদার ছিলেন যথাক্রমে সরকার ও পরগণার প্রধান নির্বাহীকর্তা।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ মোগল শাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে একটি রচনা লিখবেন।

সারাংশ

মোগল শাসন ব্যবস্থার ভিত রচনা করেন সম্রাট আকবর। এ শাসন ব্যবস্থা ছিল মূলত এককেন্দ্রিক স্বৈরতান্ত্রিক। সম্রাট ছিলেন এই শাসন ব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু। তবে তিনি তাঁর বিভিন্ন অধীনস্ত কর্মচারির সাহায্যে শাসন কাজ পরিচালনা করতেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মোগল প্রশাসন ব্যবস্থায় সম্রাটের পরের স্থান ছিল কার?
ক) কাজী-উল-কুজ্জাত খ) প্রধানমন্ত্রী বা ওয়াজির
গ) দিউয়ান ঘ) মীর বক্সি

২। মোগল প্রশাসনে রাজস্ব বিভাগ ন্যাস্ত ছিল কার উপর?
ক) দিউয়ান খ) কাজী-উল- কুজ্জাত
গ) মীর বক্সি ঘ) মীর-ই-সামান

৩। সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ কর্মকর্তা ছিলেন–
ক) দিউয়ান খ) কাজী
গ) মীর বক্সি ঘ) মীর-ই-সামান

৪। "সুবাহ"-এর প্রধান কার্যনির্বাহক ছিলেন কে?
ক) ফৌজদার খ) শিকদার
গ) সুবাহদার ঘ) দিউয়ান

৫। পরগনাহ প্রধানকে বলা হতো–
ক) সুবাহদার খ) শিকদার
গ) ফৌজদার ঘ) দিউয়ান

৬। মোগল শাসন ব্যবস্থায় দিউয়ান কে সাহায্য করতেন–
i. দিউয়ান-ই-খালাসা
ii. দিউয়ান-ই-জায়গীর
iii. দিউয়ান-ই-তাউজিব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৮ মোগল আমলের অর্থনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মোগল আমলের কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মোগল আমলের দ্রব্যমূল্যের উল্লেখ করতে পারবেন।
- মোগল যুগের বাণিজ্যের বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	কৃষি, রাজস্ব, সুরাট, কালিকট, কড়ি

অর্থনৈতিক অবস্থা

মুগল যুগে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। তবে অল্প আকারে হস্ত নির্ভর কুঠির শিল্পের বিকাশও হয়েছিল। এ ছাড়া মোঘলযুগে ভারতবর্ষে ইউরোপিয় বাণিজ্যের বিকাশ শুরু হয়। মোগল যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সমকালীন ফার্সি সাহিত্য, ইউরোপিয় পর্যটকদের বিবরণী ইত্যাদি থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া *বাবরনামা*, *হুমায়ুন নামা*, *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থ থেকেও বিশেষ তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে গুলবদন বেগমের *হুমায়ুননামা*-তে উল্লিখিত মোগল আমলের আর্থিক সচ্ছলতার প্রসঙ্গ সম্পর্কে বলা যায়।

কৃষি ও রাজস্ব নীতি

মোগল যুগে কৃষিই ছিল ভারতের জনগণের প্রধান জীবিকা ও সাম্রাজ্যের রাজস্বের প্রধান উৎস। মোগল আমলে জাবতি, গাল্লাবকস, নাসাব প্রভৃতি প্রথা অনুসারে রাজস্ব আদায় হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষকদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট হারে নগদে রাজস্ব আদায়ের নিয়ম ছিল। আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে উৎপন্ন শস্যের তিন ভাগের এক অংশ আদায় করা হত যা পরবর্তী আমলে বাড়তে থাকে। মোগল আমলে পণ্যদ্রব্যের দাম খুব কম ছিল। আকবরের আমলে টাকায় ১৫ মন গম এবং ১০ মন চাল বিক্রি হতো। সুবাহদার শায়েস্তা খানের সময় বাংলায় টাকায় ৭/৮ মন চাল বিক্রি হতো। তাছাড়া খাদ্যদ্রব্য, শাক-সবজি, জীব-জন্তুর দামও খুব সস্তা ছিল।

জনহিতকর কার্যক্রম ও বাণিজ্য-নীতি

মোগল সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সময় ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়। জল ও স্থল পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। মোগল সম্রাটগণ রাস্তার দুই পাশে পথিক ও বণিকদের সুবিধার্থে কূপ খনন, বৃক্ষরোপণ ও সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। মোগল আমলে বিদেশ থেকে হাতির দাঁত, মূল্যবান পাথর, সুগন্ধি, সিল্ক ও রেশম আমদানি করা হতো আর ভারতবর্ষ থেকে নানা প্রকার দ্রব্যসামগ্রী যেমন সূতীবস্ত্র, মসলিন, চিনি, নীল, আফিম ইত্যাদি রপ্তানি করে প্রচুর অর্থ আয় করা হতো। সুরাট, মসলি পট্টম, বোম্বাই, চট্টগ্রাম, কালিকট প্রভৃতি মোগল আমলের বিখ্যাত বাণিজ্য বন্দর ছিল। মোগল আমলে মুদ্রার প্রচলন ছিল। তবে কিছু কিছু সুবাহতে মুদ্রার পাশাপাশি কড়ি নামক একধরনের বিনিময়ের মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহৃত হত।

মোগল শাসনামলে সাম্রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। জনসাধারণ প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। মোগল বাদশাহগণ তাদের রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি জমিতে পানি দেয়ার জন্য খাল খনন, পুরানো খাল সংস্কার প্রভৃতি কৃষি সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। বাংলা-বিহারে ধান ও ইক্ষু এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে কার্পাস, পশম ও তামাক উৎপন্ন হতো। তাছাড়া গম, বার্লি, যব ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো।

মোগল আমলে মানুষের আর্থিক অবস্থা

মোগল যুগে সাম্রাজ্যের ধন-সম্পদ উচ্চশ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও জনসাধারণের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। এ সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বণিক ও ব্যবসায়ী সমন্বয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এ আমলে রাজদরবার জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিল্পের মধ্যে সুবাহ বাঙালার মসলিন বস্ত্র বিশ্বের সর্বত্র সমাদৃত হতো।

শিক্ষার্থীর কাজ	মোগল আমলের কৃষি ও অর্থনীতির উপর একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

সারাংশ

মোগল আমলে কৃষি রাষ্ট্রের প্রধান আয়ের উৎস ছিল। তখন কৃষিপণ্য ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর দাম কম ছিল। এ আমলে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে। ফলে জনসাধারণের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গুলবদন বেগম রচিত গ্রন্থের নাম কী?
ক) *বাবর নামা* খ) *হুমায়ুন নামা* গ) *আইন-ই-আকবরী* ঘ) *তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী*

২। মোগল আমলে জনগণের প্রধান জীবিকা কী ছিল?
ক) কৃষি খ) ব্যবসা বাণিজ্য গ) শিল্প ঘ) খনিজ সম্পদ

৩। মোগল আমলে রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল–
ক) ব্যবসা-বাণিজ্য খ) শিল্প গ) কৃষি ঘ) খনিজ সম্পদ

৪। সুবাহ বাংলায় শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় কত মন চাল বিক্রয় হতো?
ক) ৫/৬ খ) ৬/৭ গ) ৭/৮ ঘ) ৮/৯

৫। আকবরের আমলে টাকায় গম বিক্রয় হতো–
ক) ১৫ মন খ) ১৭ মন গ) ১৮ মন ঘ) ২০ মন

৬। "মসলিন বস্ত্র" ভারত বর্ষের কোথায় উৎপাদিত হতো?
ক) মাদ্রাজে খ) বাংলায় গ) বিহারে ঘ) উড়িষ্যায়

৭। মোগল আমলের অর্থনীতির তথ্য পাওয়া যায়–
i. সমকালীন ফার্সি সাহিত্যে
ii. ইউরোপিয় পর্যটকদের বিবরণীতে
iii. *বাবর নামা*, *হুমায়ুন নামা*, *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৯ মোগল যুগের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মোগল যুগের সামাজিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন।
- মোগল যুগের ধর্মীয় সম্প্রিতী ও সহঅবস্থানের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মোগল যুগের শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলার উন্নতির উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	আমীর উমরাহ, সামন্ত, কারিগর , শিল্পী

জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর মধ্য এশিয়ার ফারগানা রাজ্য থেকে এসে ভারতবর্ষে মোগল শাসনের সূত্রপাত করেন। পরবর্তীতে তার উত্তরসূরীরা সময়ের পরিক্রমায় সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী একটি সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য গড়ে তুলে। এ সময়ে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সাহিত্য ক্ষেত্রে ব্যপক উন্নতি সন্বিত হয়। নিম্নে মোগল যুগে ভারতের সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় সম্প্রিতী, শিক্ষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

সামাজিক অবস্থা: মোগল যুগে ভারতীয় সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সমাজ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। উচ্চবিত্ত অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বা সাধারণ শ্রেণি। সম্রাট ছিলেন সমাজের প্রধান। সাম্রাজ্যের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ছিলেন

অভিজাত শ্রেণিভুক্ত। সম্রাটের দরবারের আমীর, উমরাহ ও মন্ত্রীগণসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণির জীবনযাত্রা ছিল বিলাসবহুল। অভিজাত শ্রেণি সম্রাটের অনুগ্রহপুষ্ট ছিলেন। তারা সম্রাটের নিকট থেকে জায়গীর লাভ করতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে মোগল ভারতে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। এর প্রভাবে সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে ছিল ব্যবসায়ী, কারিগর, শিল্পী, দোকানদার, চিকিৎসকে লেখক প্রমূখ পেশাজীবী শ্রেণী। তারা অভিজাতদের ন্যায় জামজমকপূর্ণ জীবনযাপন করতেন না। তারা অভিজাত শ্রেণি বা ব্যবসায়ীদের স্তরে সমকক্ষ সামাজিক মর্যাদায় ছিল না। সমাজ জীবনের নিম্নস্তরে ছিল কৃষক ও মজুর শ্রেণি। এরা সংখ্যায় অধিক হলেও সামাজিক কোনো প্রতিপত্তি ছিল না। কায়িক শ্রমই ছিল তাদের জীবিকার অন্যতম অবলম্বন অর্থ কষ্টে তাদের দিন অতিবাহিত হতো।

মোগল সম্রাটরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী হলেও এ সময়ে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রীয়ভাবে সমান মর্যাদায় দেখা হতো। মুসলিমদের পাশাপাশি হিন্দুরাও এ সময় ভারতবর্ষে অন্যতম ধর্ম। কিন্তু মোগলদের উদার নীতির ফলে মোগলযুগে ভারতীয় সমাজে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি বিরাজমান ছিল। ধর্মীয় ব্যাপারে হিন্দুদের স্বাধীনতা ছিল। হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রবল ছিল। তদানিন্তন হিন্দু সমাজে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কারও প্রচলিত ছিল। মোগল আমলে সাধারণ নারীদের অবস্থা উন্নত ছিল না। সমাজে নারীদের অগ্রগতির পথে অনেক বাধা ছিল। অভিজাত শ্রেণি হারেম রাখত এবং হারেমে বহু দাসী ও পরিচারিকা নিয়োগ করা হতো। এ আমলে নারী পুরুষ উভয়ই স্বর্ণ ব্যবহার করত। চিত্তবিনোদনের জন্য সঙ্গীত, দাবা, পাশা খেলা, পোলো, রথ দৌড়, সাঁতার ইত্যাদি ব্যবস্থা ছিল।

শিক্ষা: শিক্ষা ক্ষেত্রে মোগল শাসনামল ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মোগল সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, টোল, মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সম্রাট আকবর ছিলেন বিশেষ শিক্ষানুরাগী। তার সময়ে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা হয়। জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেবও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। মোঘল বাদশাহদের পাশাপাশি স্থানীয় শাসক ও জমিদারগণ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এ সময়ে আরবি, ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা দেয়া হতো। মোগল আমলে রাষ্ট্র ভাষা ছিল ফার্সি।

সাহিত্য: মোগল যুগ ছিল সাহিত্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গৌরবময়। মোগল সম্রাটগণ অনেকেই সুসাহিত্যিক ছিলেন। সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসি সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধশালী হয়। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও এ যুগ ছিল উল্লেখযোগ্য। মোগল সম্রাটদের প্রত্যেকে সাহিত্য অনুরাগী ছিরেন। তাদের অনেকেই সাহিত্য রচনাও করেছেন। মোগল আমলে ফার্সি সাহিত্যের পাশাপাশি স্থানীয় হিন্দুস্থানী সাহিত্য এবং বাংলা ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব সাহিত্য বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। মোগল বাদশাহ ও সুবাহদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসিতে অনুবাদ করা হয়। এ সময়ে উর্দু সাহিত্যও উৎকর্ষ লাভ করে।

ধর্মীয় জীবন: মোগল আমলে ধর্মীয় উদারতা বিদ্যমান ছিল। মোগল সম্রাট আকবর দীন-ই-ইলাহী ধর্মমত চালু করেন। সাময়িক সুফল পেলেও সুন্নী মুসলমানরা আকবরের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। সমাজে হিন্দু মুসলিম ছাড়া শিখ ধর্মাবলম্বীরা প্রধান ছিলেন। ষোড়শ শতকের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব সপ্তদশ শতাব্দীতে পরিলক্ষিত। এ সময় মুযাদ্দিদ-ই-আলফে সানী নামক ধর্মীয় নেতা ইসলাম ধর্মের সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। মোগল আমলে অনেক বিখ্যাত মসজিদ নির্মিত হয়। দিল্লির মতি মসজিদ, জামে মসজিদ আজও মোগল কীর্তি বহন করছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মোগল যুগের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন নিয়ে একটি আলোচনা সভা আয়োজন করবেন।

সারাংশ

মোগল সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সম্রাট ছিলেন এ সমাজ ব্যবস্থার প্রধান। এ সমাজে তিন শ্রেণির লোক বাস করতেন এবং এদের মধ্যে সম্প্রীতি বিরাজমান ছিল। শিল্প সাহিত্য ক্ষেত্রে মোগল যুগের অবদান অবিস্মরণীয়। ফার্সি সাহিত্যের পাশপাশি ভারতের স্থানীয় সাহিত্যও এ যুগে উৎকর্ষ লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মোগল যুগের সমাজ ব্যবস্থা কত শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল?
ক) দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ

২। সম্রাটের নিকট থেকে জায়গীর লাভ করত কোন শ্রেণির লোকেরা?
ক) মধ্যবিত্ত খ) নিম্নবিত্ত গ) অভিযাত ঘ) সাধারণ শ্রেণির

৩। কৃষক ও মজুরেরা কোন শ্রেণিভুক্ত ছিল?
ক) অভিযাত খ) নিম্নবিত্ত গ) মধ্যবিত্ত ঘ) সাধারণ শ্রেণি

৪। মোগল আমলের রাষ্ট্র ভাষা ছিল কী?
ক) ফার্সি খ) আরবি গ) উর্দু ঘ) বাংলা

৫। বৈষ্ণব সাহিত্য কোন ভাষায় রচিত?
ক) আরবি খ) ফার্সি গ) বাংলা ঘ) উর্দু

সৃজনশীল প্রশ্ন

কৃষ্ণপদ সনাতন ধর্মের অনুসারী। তার সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছাড়াও বহুবিধ ধর্মীয় কুসংস্কার প্রচলিত। তার বোন হরিদাসির বিয়ে হয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাথে। বিয়ের কিছুদিন পর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পরলোক গমন করলে হরিদাসির পিতা জীবনদাস একমাত্র কন্যাকে স্বামীর চিতায় দাহ না করায় তাদেরকে সমাজ চ্যুত করা হয় এবং এলাকা থেকেও বিতাড়িত করা হয়।

ক. কোন সম্রাটের সময় বৈষ্ণব সাহিত্য উৎকর্ষ লাভ করে? ১
খ. সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কাকে বলে? ২
গ. উদ্দীপকের সমাজ ব্যবস্থার সাথে পাঠ্য পুস্তকের কোন আমলের সমাজ ব্যবস্থার সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সমাজে "জাতিভেদ প্রথা" প্রচলিত ছিল।" পাঠ্য পুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

পাঠ-৩.১০ মোগল আমলের স্থাপত্য কলা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মোগল সম্রাটের নির্মিত স্থাপত্য কর্মগুলোর পরিচয় দিতে পারবেন।
- মোগল স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মোগল সম্রাটদের স্থাপত্য শিল্পে অবদানের বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	দীন-পানাহ, ফতেহাবাদ, দুর্গ, সৌধ, বুলন্দ দরওয়াজা, পাঁচ মহল

মোগল সম্রাটগণ স্থাপত্য শিল্পের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মোগল স্থাপত্য ভারতবর্ষে মুসলিমদের আগমনের পর থেকে ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে একটি নতুন স্থাপত্য ঘরানার জন্ম হয়। সুলতানী আমলের বিভিন্ন স্থাপত্যকর্মে এ ধারার স্থাপত্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটিত হয়েছিল। পরবর্তীতে মোগল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় এটি পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে এবং পূর্নাঙ্গ রুপ ধারণ করে। শুরুতে মোগল স্থাপত্য রীতিতে পারসিক প্রভাব লক্ষ করা গেলেও সম্রাট আকবরের স্থাপত্য কর্মগুলোতে ভারতীয় প্রভাব প্রাধান্য পায়। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সম্রাটদের সময় নির্মিত স্থাপত্যের বর্ণনা দেয়া হলো।

বাবরের সময়ের স্থাপত্যসমূহ: সম্রাট বাবর কেবলমাত্র মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না, তিনি স্থাপত্য শিল্পের ও একজন অগ্রপথিক ছিলেন। তাঁর সময়ে আগ্রায় পানিপথের কাবুলিবাগ নামক স্থানে মসজিদ নির্মিত হয়।

হুমায়ুনের সময় স্থাপত্যসমূহ: হুমায়ুনের আমলে দিল্লিতে দীন-পানাহ ভবন, আগ্রায় ও ফতেহাবাদে নির্মিত মসজিদ তাঁর সময় কালের স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন।

আকবরের সময়ের স্থাপত্যসমূহ: শিল্প ও স্থাপত্যের বিশেষ অনুরাগী আকবরের আমলে পারসিক ও ভারতীয় স্থাপত্য রীতির সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর আমলের স্থাপত্য শিল্পে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত লাল পাথরের বিশেষ ব্যবহার এবং দ্বিতীয়ত ইমারতের বৃহদায়তন। আকবরের আমলে নির্মিত প্রাসাদ, দুর্গ, মসজিদ ও সৌধগুলোর মধ্যে ফতেহপুর সিক্রি, হুমায়ুনের সমাধি, ইবাদতখানা, বুলন্দ দরওয়াজা, পাঁচ মহল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সিকান্দ্রায় নির্মিত অপূর্ব সমাধি সৌধটির পরিকল্পনা তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রস্তুত হয়েছিল। ফতেহপুর সিক্রির জামে মসজিদ শেখ সেলিম চিশতির সমাধি ও বুলন্দ দরওয়াজা আজও সকলের বিস্ময় উদ্রেক করে।

জাহাঙ্গীরের ভূমিকা: সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে আকবরের সমাধি সৌধ, ইতমাতুদ্দৌলার সমাধি সৌধ এবং তাঁর নিজের জন্য নির্মিত সমাধি সৌধের নাম উল্লেখ করা যায়। শ্বেত পাথরের ব্যবহার এই সময়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

শাহজাহানের সময় কালের স্থাপত্যসমূহ: স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মোগল সম্রাটদের মধ্যে সম্রাট শাহজাহান ছিলেন অদ্বিতীয়। স্থাপত্য শিল্পে উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাঁর সময়কালকে স্থাপত্য শিল্পের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তিনি তাঁর স্ত্রী মমতাজ মহলের সমাধির উপর অবিনশ্বর প্রেমের এক অনিন্দ্য সুন্দর সৌধ তাজমহল নির্মাণ করেন। তাঁর আমলে আগ্রার মতি মসজিদ, দিল্লির জামে মসজিদ, দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস নির্মিত হয়। দিওয়ান-ই-খাসের অপূর্ব নির্মাণ শৈলী এবং শিল্পকর্মের চমৎকারিত্যের জন্য এটি 'দুনিয়ার বেহেস্ত' বলে অভিহিত। ভুবন বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন মনি-মুক্তা, হীরা ও মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরি। ময়ূর সিংহাসন সম্রাট শাহজাহানের শিল্পানুরাগের অন্যতম কীর্তি। তিনি 'শাহজাহানাবাদ' নামে একটি নতুন শহরও নির্মাণ করেন যা বর্তমানে নতুন দিল্লি নামে পরিচিত। লাহোরে অবস্থিত সালিমার উদ্যান সম্রাটের স্থাপত্য রুচির অপরূপ নিদর্শন।

আওরঙ্গজেবের সময়ের স্থাপত্যসমূহ: সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে নির্মিত লাহোরের বাদশাহী মসজিদ স্থাপত্য শিল্পের এক বিশেষ নিদর্শন। তিনি দিল্লির দুর্গের ভিতরও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

স্থাপত্য শিল্পের পাশাপাশি চিত্রকলার প্রতিও মোগলদের অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। পারসিক প্রভাবে উদ্ভূত মোগল মিনিয়েচার ছিল অনন্য চিত্ররীতি। মিনিয়েচারগুলোতে দৃশ্যকল্প চিত্রায়ন, জলরঙের ব্যবহার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কালক্রমে ভারতীয় চিত্রকলার প্রভাব এটিতে সংমিশ্রিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে এটি ইউরোপিয় শিল্প রীতির সংমিশ্রণে উৎকর্ষ সাধন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মোগল আমলের স্থাপত্য কলার উপর একটি নিবন্ধ লিখুন।

সারাংশ

মোগল যুগে স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্রায় সব মোগল সম্রাট স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আকর্ষণীয় সৌধ, ইমারত, মসজিদ, উদ্যান এমনকি ময়ূর সিংহাসন মোগলদের কীর্তির অবিনশ্বর স্বাক্ষর বহন করে। মোগল যুগে চিত্রশিল্পও বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। "দীন পানাহ" ভবন কোথায় অবস্থিত?

ক) দিল্লিতে খ) আগ্রায় গ) লাহোরে ঘ) ফতেহপুর সিক্রিতে

২। পানি পথের কাবুলিবাগে মসজিদ নির্মাণ করেন কে?

ক) বাবর খ) হুমায়ুন গ) আকবর ঘ) জাহাঙ্গীর

৩। "বুলন্দ দরওয়াজা" কে নির্মাণ করেন?
ক) বাবর খ) হুমায়ুন গ) আকবর ঘ) জাহাঙ্গীর

৪। কোন সম্রাটের শাসনকালকে স্থাপত্য শিল্পের স্বর্ণযুগ বলা হয়?
ক) আকবর খ) জাহাঙ্গীর গ) শাহজাহান ঘ) আওরঙ্গজেব

৫। "দুনিয়ার বেহেস্ত" নামে অভিহিত কোনটি?
ক) দিউয়ান-ই-খাস খ) দিউয়ান-ই-আম গ) আগ্রার মতি মসজিদ ঘ) দিল্লির জামে মসজিদ

৬। ভূবন বিখ্যাত ময়ুর সিংহাসন ছিল–
i. মনি, মুক্তা, হিরার তৈরি
ii. মূল্যবান পাথরের তৈরি
iii. শাহজাহানের শিল্পানুরাগের অন্যতম কীর্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.১১ মোগল সাম্রাজ্যের পতন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মোগল সাম্রাজ্য পতনের অভ্যন্তরীণ কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- মোগল সাম্রাজ্য পতনে বৈদেশিক আক্রমণের বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	পরারাষ্ট্রনীতি, কোন্দল, বিরোধ

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জহিরউদ্দিন বাবর কর্তৃক ভারতবর্ষে মোগল বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে তার উত্তরসূরীরা এটিকে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে রুপান্তরিত করে। বাবর থেকে আওরঙ্গজেব অর্থাৎ ১৫২৬ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোগল শাসন ছিল স্বর্ণযুগের শাসন। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল শাসনের পতনে প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৮৫৭ সালে শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর ইংরেজ কর্তৃক নির্বাসিত হলে মোগল শাসনের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি হয়। তাই ১৭০৭ থেকে ১৮৫৭ সময় কালকে (প্রায় দেড়শ বছর) মোগল বংশের পতনের যুগ বলা হয়। সামগ্রিকভাবে মোগল সাম্রাজ্য পতনের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বহিঃআক্রমন প্রভৃতি বিষয়কে দায়ী করা হয়।

১. **দুর্বল শাসন:** মোগল সাম্রাজ্য আকারে এবং আয়তনে বিশাল ছিল। তাই রাজ্য শাসনের জন্য ছিল যোগ্য শাসকের প্রয়োজন। কিন্তু আওরঙ্গজেব পরবর্তী শাসকগণ ছিলেন অযোগ্য। তাই অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার মতো কোনো ক্ষমতা এবং যোগ্যতা তাদের ছিল না।

২. **সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার নীতির অভাব:** মোগল সিংহাসনে আরোহণের কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। কাজেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে মোগল যুবরাজদের নিজেদের আত্মঘাতী সংগ্রাম কেন্দ্রীয় শক্তি এবং ঐক্য নষ্ট করে। মোগল সাম্রাজ্য পতনের এটি অন্যতম প্রধান কারণ।

৩. **অভিজাতদের দুর্বলতা:** অভিজাত সম্প্রদায় এককালে মোগল সাম্রাজ্যের সংহতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নিজেদের জীবনকে বাজী রেখে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। পরবর্তী কালে তারা বিলাসপ্রিয় এবং কোন্দল পরায়ণ হয়ে পড়লে সাম্রাজ্যের ভিত ও সংহতি বিনষ্ট হয়।

৪. **সামরিক শক্তির দুর্বলতা:** সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে সামরিক শক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরবর্তী মোগল শাসকদের সময়ে সামরিক শক্তি অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়। বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে মোগলদের বিশাল সামরিক বাহিনী গঠিত হয়েছিল। দুর্বল শাসকদের আমলে সেনাবাহিনী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিলাসিতা ও চারিত্রিক অবনতির ফলে সেনাবাহিনীর সামরিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়। মোগলদের নৌশক্তির দুর্বলতা সাম্রাজ্যের পতন অন্যতম কারন।

৫. **আর্থিক সংকট:** মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক ও সামরিক সেনাবাহিনী পোষণে প্রচুর অর্থ ব্যয় হতো। তাছাড়া আওরঙ্গজেবের দীর্ঘদিন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ পরিচালনা করলে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। পরবর্তী শাসকদের আমলে আয়ের পথ সংকীর্ণ হয়ে যায়। তাই আর্থিক দুরবস্থা সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

৬. **আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে অবস্থান:** আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘ সময় অবস্থানের ফলে রাজধানী থেকে তাঁর অনুপস্থিতি কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে অনেক দিক থেকে দুর্বল করে দেয়। ফলে এ সময়ে উত্তর ভারতে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় যা সাম্রাজ্যের পতনের পথ উন্মুক্ত করে।

৭. **বিভিন্ন জাতির বিদ্রোহ:** আওরঙ্গজেবের দুর্বল বংশধরদের রাজত্বকালে মারাঠা, শিখ, জাঠ, রাজপুতদের বিরোধিতা ও বিদ্রোহ মোগল শক্তি ও সংহতি বিনষ্ট করে।

৮. **প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা:** কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ দূরবর্তী প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্ব স্ব এলাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এর ফলে সাম্রাজ্যের সংহতি হুমকির সম্মুখিন হয়।

৯. **জাতীয়তাবোধের অভাব:** মোগল সম্রাটগণ ভারতবর্ষের জনগণকে কোনো একক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন নি। তাই অভিন্ন জাতীয়তাবোধের অভাবে বিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রাম দেখা দেয়।

১০. **বিদেশি শক্তির আক্রমণ:** পারস্য সম্রাট নাদিরশাহ এবং পরবর্তীকালে আফগান রাজা আহমদ শাহ আবদালীর দিল্লি আক্রমণ ও লুণ্ঠনে মোগল সাম্রাজ্য দুর্দশায় ও পতনুম্মুখ হয়ে পড়ে। এমনি মুমূর্ষ অবস্থায় ইংরেজ শক্তির ক্ষমতা দখল করার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়ার কারণে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে রেঙ্গুনে (বার্মা) নির্বাসিত করেন। বাহাদুর শাহের নির্বাসনের মধ্য দিয়ে ভারতে মোগল শাসনের চূড়ান্ত অবসান ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ মোগল সাম্রাজ্যের পতন নিয়ে একটি বিতর্ক সভা আয়োজন করবেন।

সারাংশ

মোগল সাম্রাজ্য আকারে এবং আয়তনে বিশাল ছিল। এমনি সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যোগ্য শাসকের প্রয়োজন। অথচ সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরবর্তী সম্রাটগণ দুর্বল, বিলাস প্রিয় ছিলেন। এই কারণ ছাড়াও অন্যান্য নানাবিধ কারণে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মোগল বংশের শেষ সম্রাট কে?

ক) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ খ) শাহ আলম গ) মুহাম্মদ শাহ ঘ) ফররুখশিয়ার

২। কত খ্রিস্টাব্দে মোগল শাসনের চির অবসান ঘটে?

ক) ১৮৫৬ খ) ১৮৫৭ গ) ১৮৫৮ ঘ) ১৮৫৯

৩। নাদির শাহ সম্রাট ছিলেন–
ক) আফগানিস্তানের খ) তুরস্কের গ) পারস্যের ঘ) মিশরের

৪। কোন আফগান রাজা দিল্লি আক্রমন ও লুণ্ঠন করেন?
ক) রেজাশাহ খ) নাদির শাহ গ) দোস্ত মোহাম্মদ ঘ) আহমদ শাহ আবদালী

৫। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে কোথায় নির্বাসিত করা হয়?
ক) রেঙ্গুন (বার্মা) খ) শ্রীলংকায় গ) মালদ্বীপে ঘ) অস্ট্রেলিয়া

সৃজনশীল প্রশ্ন

করিমখান পিতৃ সিংহাসন উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে পরবর্তীতে অনেক চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডে এক নতুন রাজ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তার মৃত্যুর পর উত্তরসুরীরা প্রায় দুইশত বছর শৌর্য-বীর্যের সাথে রাজ্য শাসন করলেও পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের দুর্বল শাসন, সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা, আর্থিক সংকট, প্রাদেশিক শাসকদের স্বাধীনতা ঘোষণা, বিভিন্ন জাতির বিদ্রোহ সর্বোপরি বিদেশি শক্তির আক্রমনে করিমখানের প্রতিষ্ঠিত রাজ বংশের শাসনের অবসান ঘটে।

ক. কত খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ১

খ. ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচয় দিন। ২

গ. উদ্দীপকের রাজবংশ পতনের সাথে পাঠ্য পুস্তকের যে রাজ বংশের পতনের সাদৃশ্য পাওয়া যায় তার পতনের কারণ ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. উক্ত রাজ বংশ পতনে দুর্বল উত্তরাধিকারীদের ভূমিকা নিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ক ৫। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ ঃ ১। গ ২। গ ৩। গ ৪। গ ৫। ঘ ৬। ক ৭। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩ ঃ ১। গ ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪ ঃ ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। খ ৫। গ ৬। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। গ ৪। খ ৫। খ ৬। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। খ ৫। ঘ ৬। ক ৭। ক ৮। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। গ ৫। খ ৬। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৮ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। গ ৫। ক ৬। খ ৭। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৯ ঃ ১। খ ২। গ ৩। খ ৪। ক ৫। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১০ ঃ ১। ক ২। ক ৩। গ ৪। গ ৫। ক ৬। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১১ ঃ ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক